প্রাচীন পীড়া তার কারণ ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা

ডাঃ নীলকমল বর্মন

মডার্ণ পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা, ১১০০।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পীড়ার প্রকৃত নিদান	১৩
রোগ ও রোগী	২০
মন ও দেহ	২৬
নূতন ও পুরাতন পীড়া	৩১
চাপা দেওয়া রোগ	৩৬
প্রকৃত আরোগ্য	৩৮
রোগী পরীক্ষা ও লক্ষণ সংগ্রহ	৪২
প্রথম ওষুধ সেবন ও পর্যবেক্ষণ	৪৯
দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র	৫৬
লক্ষণের গুরুত্ব ও বিশ্লেষণ	৫৯
প্যাথলজি ও হোমিওপ্যাথি	৬৬
প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য	৬৯
চিকিৎসা চলাকালীন তরুণ রোগের আবির্ভাব	৭২
সদৃশ ও সদৃশতম	৭৬
খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ	৭৮
হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্রিয়াভূমি	৮০
স্থান পরিবর্তনের মাহাত্ম্য	৮৩
মানুষের মন ও মনস্তত্ত্ব	৮৫
সোরা	৮৯
সাইকোসিস	৯৮
সিফিলিস	১০৫
টিউবারকুলার	১০৯
ক্যান্সারাস	১১৫
মিশ্র মায়াজম	১২৩

মায়াজমের গুণাবলি	১২৬
অবদমন	১২৯
জীবনীশক্তি	১৩৫
হোমিও পোটেন্সি বা শক্তি নির্ণয়	১৩৯
এ্যান্টিমায়াজমেটিক ওষুধের সংক্ষিপ্ত তালিকা	১৪৩
জেনেটিক ডিসঅর্ডার	১৪৬
জন্মের আগে চিকিৎসা	১৫৫
নোসোড	১৬১
Few rarely used nosodes with indication	১৬৬
Miasmatic reflection in disease...	১৭১
Disease due to chromosomal abnormalities	১৭৮
Family history and their probable medicines	১৮৪
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু	১৮৭
অপ্রচলিত ওষুধ	১৯২
কিছু দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা	১৯৮
কুফল	২০৪
DNA	২০৫
করোনারি হার্ট ডিজিজ	২১৪
উইলসন ডিজিজ	২১৭
কিডনি ক্যান্সার	২২২
ক্যালসিফিকেশন	২২৫
হেপাটাইটিস বি	২২৮
সদৃশতম ওষুধ নির্বাচনের উপায়	২৩২
বিজ্ঞানের দীর্ঘ পরিক্রমায় হোমিওপ্যাথির অবস্থান ও গুরুত্ব	২৪৪
বিবিধ প্রসঙ্গ	২৫৬
সহযোগী বই এর তালিকা	২৬৪

১ পীড়ার প্রকৃত নিদান

আমরা রোগ ও রোগের কারণ, প্যাথলজি, রিপোর্ট বা ডায়্যাগনোসিস নিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এত বেশি মাতোয়ারা হয়ে উঠি যে হোমিওপ্যাথদের আসল কাজটার কথা বেমালুম ভুলে যাই এবং লক্ষ্য থেকে দূরে, নীতিচ্যুত হয়ে থমকে যাই। হোমিওপ্যাথদের আসল কাজটা করার জন্য খুব বেশি একটা সময় পাই না। আর সেই জন্যই আমরা পথভ্রষ্ট হই। আমাদের পরিশ্রম বৃথা যায়। আমরা মরীচিকায় পথ হারিয়ে ফেলি। হোমিওপ্যাথি আর হোমিওপ্যাথির মধ্যে থাকে না।

আধুনিক বিজ্ঞান এ কথাই স্বীকার করে যে, দূষিত জলে ম্যালেরিয়ার বীজ (Malaria parasite- Plasmodium falciparum, vivax etc) জন্মে এবং সেই মশা দূষিত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে, মনুষ্য শরীরে দংশনের মাধ্যমে রোগের সঞ্চার করে। বিজ্ঞানাগারে মশার জীবনচক্র প্রমাণিত — প্রমাণিত হয়েছে মানব শরীরে তার জীবনচক্র প্রণালী। আসলে অ্যালোপ্যাথিক মতে নিদানের বিপরীতেই চিকিৎসা অনুমোদিত, কাজেই অ্যালোপ্যাথিক মতে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মূল কথা এইটাই। কিন্তু যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ — যিনি হোমিও তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন —তিনি সঠিক ভাবেই জানেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, পীড়ার কারণ বাইরে নয়, তবে বাইরের কারণগুলি কেবলমাত্র উত্তেজক কারণ হিসাবে গণ্য হয়।

আজ জীবাণুবাদ (virus, bacteria, parasite প্রভৃতি) বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর এনেছে একথা বহুলাংশেই সত্য। কিন্তু এই সব জীবাণু যদি সত্যই এত শত্রুভাবাপন্ন হত তবে কি মনুষ্যজাতি তার মানব অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারতো? কারণ এই সব জীবাণু এত অল্প সময়ে তার উপযুক্ত পরিবেশে এত বেশি মাত্রায় বংশ বিস্তার করে যে তার কোন সীমা পরিসীমা থাকে না। যত দূর জানি, একটি জীবাণু চব্বিশ ঘন্টায় তিরিশ লক্ষ কোটি জীবাণুর জন্ম দিতে পারে। অতএব এই সকল আণুবীক্ষণিক জীবাণু গুলিকে শত্রুভাবাপন্ন মনে করে তাদের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়। বড়জোর তাদের উত্তেজক কারণ হিসাবে পরিগণিত করা চলে।

ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে সবাই কি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন? সবার জ্বর হলেও সব জ্বরের গতি-প্রকৃতি কি এক রকম হয়? না কি সব জ্বরে একই ওষুধে একই চিকিৎসা করা উচিত? অ্যালোপ্যাথিতে তা সমর্থন যোগ্য হলেও প্রকৃত হোমিওপ্যাথিতে তা সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের জানা উচিত হোমিওপ্যাথির প্রকৃত সংজ্ঞাটি কি? **কোন সুস্থ ব্যক্তি কোন ওষুধ দ্রব্য সেবন করলে তার শরীরে ও মনে যে রকম উপদ্রব, কষ্ট বা লক্ষণ প্রকাশিত হয়, রোগ বশতঃ কোন ব্যক্তির শরীরে ও মনে সেই রকম কোন কষ্ট বা লক্ষণ উপস্থিত হলে, সেই ওষুধ সেবনেই সেই সকল লক্ষণ বিদূরিত হয়।** যথা, কোন সুস্থ ব্যক্তি "কাঠবিষ" বা Aconite nap নামক ওষুধ সেবন করলে তার মনে মৃত্যুভয়, অস্থিরতা এবং তার শরীরে ঘর্মশূন্য উত্তাপ, প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন রোগ বশতঃ সে রকম লক্ষশ শরীরে ও মনে উপস্থিত হলে সেই "কাঠবিষ" (Aconite nap) সেবন করলেই উক্ত লক্ষণ যুক্ত রোগ সমূহের আরাম হবে। এরই নাম 'সদৃশ বিধান' বা হোমিওপ্যাথি।

হোমিওপ্যাথির নিরিখে কোন রোগেরই নির্দিষ্ট কোন ওষুধ হয় না। যে কোন জ্বরের বেলায় সে কথা প্রযোজ্য। জেলসিমিয়ামের জ্বরের লক্ষণের সাথে মিলে গেলে তবেই আমরা জেলসিমিয়াম দেব। অ্যালোপ্যাথিতে কুইনাইন বা প্যারাসিটামল তাঁদের দৃষ্টিতে ব্যবহার যোগ্য হলেও হোমিওপ্যাথিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার ব্যবহার স্থল পৃথক, স্বতন্ত্র।

প্রকৃত হোমিওচিকিৎসা প্যাথলজি নির্ভর নয় — বীজাণু ভিত্তিক নয়, বীজাণু বিনাশক সরাসরি ওষুধ নিয়ে আমরা মাতোয়ারা হই না। একথা স্বীকার করতেই হবে বীজাণু গুলি রোগের ফল (result) মাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে উত্তেজক কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই রোগী বা তার গৃহস্থের পক্ষে বিষয়গুলি এড়িয়ে চলা মঙ্গলদায়ক বটে, তবে হোমিও মতে এই "কারণ তত্ত্ব" অনাবশ্যক।

ভিতরের কারণকে লক্ষ না করে বা গুরুত্ব না দিয়ে শুধু মাত্র বাইরের কারণকে গুরুত্ব দিলে বা মাতামাতি করলে বা ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমাদের সমূহ বিপদ। অতএব যদি অর্ন্তদৃষ্টি থাকে তবে রোগীর দেহ মধ্যস্থিত সোরা বিষ বা প্রমেহ বিষ বা উপদংশ বিষ যাই থাক, তার প্রতিষেধক প্রয়োগ করে আমাদের জ্বর উপশম বা নিরাময়ের কথা ভাবতে হবে। অন্যথায় আরোগ্য যথাযথ হবে না।

এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির আরও একটি গূঢ় তত্ত্ব জানতে হবে। ধরুন, কোন রোগীর ক্ষয়রোগ হয়েছে, যথা Lung tuberculosis. অ্যালোপ্যাথি মতে যতক্ষণ না আপনি X-Ray, Blood test, A.F.B. অথবা Koch's bacillus পাচ্ছেন ততক্ষণ টি.বি

সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছেন না। টি.বি'র চিকিৎসাও করাও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এ ক্ষেত্রে শরীরে tubercular germ পাওয়াই শেষ কথা। অ্যালোপ্যাথি মনে করে, tubercular germ বা tubercular bacillus is the cause of the disease. কিন্তু হোমিওচিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক। হোমিওপ্যাথির philosophy হল, tubercular germ is the result of the disease.

ধরুন, একটি আপেল পেকে, পচে তাতে পোকা দেখা দিয়েছে। অ্যালোপ্যাথি বলবে — পোকা পাওয়া গেছে, অতএব আপেলটি পচেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। হোমিওপ্যাথি বলবে, পচেছে বলেই পোকা পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা যাকে result বলি, ওনারা তাকে বলেন cause. রোগ ও রোগী সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনায় এক্ষেত্রে আমরা অনেক খানি এগিয়ে আছি বলেই আমার বিশ্বাস।

অ্যালোপ্যাথরা রোগের পরিণতি বা ফলকেই রোগ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রকৃত হোমিওপ্যাথরা তা করেন না। প্রজাপতিকে দেখে গুটি পোকার অতীত এবং গুটি পোকাকে দেখে 'ভবিষ্যত-প্রজাপতিকে' উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও দক্ষতাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথদের যথার্থ জ্ঞান, পরম ঐশ্বর্য, একথা মানতেই হয়।

তাহলে রোগের প্রকৃত কারণ বা নিদান কি?

মহাত্মা হ্যানিম্যান তৎকালীন সমস্ত চিন্তা ভাবনা ভেঙে প্রথম জানালেন, **মন থেকেই প্রকৃত(আদি) রোগের সৃষ্টি। আর তারই মূলে রয়েছে এক এবং অদ্বিতীয় সোরা (PSORA) I Psora is the mother of all diseases.** সোরাই যে কোন পীড়ার প্রকৃত কারণ। তিনি আরও জানালেন, তরুণ পীড়া মাত্রেই সুপ্ত সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস — A sudden explosion of Psora.

এবার স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সোরা কি? সোরা দোষ বলতে আমরা কি বুঝব? উত্তর হল — সোরা মানব শরীরের একটি অবস্থা মাত্র। A state, a pollution, a stain.অনেকে সোরা অর্থে খোস পাঁচড়াকে মনে করেন। মনে করেন এটি একপ্রকার চর্মরোগ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বড়জোর বলা যেতে পারে, খোস পাঁচড়া সোরার ফল মাত্র। কারও শরীরে খোস পাঁচড়া হয়েছে দেখে বুঝতে হবে তার শরীর সোরাদোষ যুক্ত। যার শরীরে সোরা দোষ নেই তার খোস পাঁচড়া হওয়া অসম্ভব।

সোরার প্রভাবেই মানুষের মন বিশৃঙ্খল হয়। মানুষ যতদিন প্রকৃতির নিয়ম প্রতিপালিত করেছে ততদিন কোন প্রকার সোরা দোষ ছিল না। যখনই মানুষ প্রতিহিংসা পরায়ণ হল, সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হল, কু-ইচ্ছা, কু-মনন, কু-চিন্তায় নিমজ্জিত হল, তখনই মন ও শরীরে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলার উন্মেষ দেখা দিল। এই মানসিক

বিশৃঙ্খলাই সোরার পূর্বরূপ বা সোরার প্রথম পদক্ষেপ। মানুষ যতদিন ন্যায় সংগত জীবন যাপন করেছে ততদিন তার রোগ প্রবণতা ছিল না।স্রষ্টার নিয়মাবলি উল্লঙ্ঘন করে মানুষ যখন পরস্পরের প্রতি অ-সত্য, অন্যায় আচরণ শুরু করল, তখনই মানুষের সুশৃঙ্খলিত মন বিশৃঙ্খলিত হল। সোরার সৃষ্টি তখনই। এটি একটি মানসিক অবস্থা বিশেষ। A state of the mind — তখনও কার্য বিপর্যয় ঘটেনি, শুধু মাত্র অবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে মাত্র — no functional change yet — কিন্তু ভবিষ্যতে কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। **মনোদুষ্টির রমরমা অবস্থায় কর্মদুষ্টির সূচনা মাত্র।** শুরু হল সোরার অঙ্কুরোদ্‌গম।

নলের শরীরে কলির প্রবেশ আর মানব মানসে সোরার উন্মেষ আক্ষরিক অর্থে রোগবীজ এবং স্বাস্থ্য ধ্বংসের যুগপৎ ও সমান্তরাল ঘটনা মাত্র। কারণের সৃষ্টি যখন হয়েছে, কার্য আসবেই।

তাহলেই দেখা গেল, প্রথমে অসৎ চিন্তা আসে মনে। এটাকে বলতে পারি মনের চুলকানি বা 'কন্ডুয়ণ'। কন্ডুয়ণের পরেই মনেও জ্বালা অনুভূত হয়। জ্বালা থেকেই অস্থিরতা, অন্যায় আচরণ, আর তার পরেই শরীরে তার বহিঃপ্রকাশ। শুরু হল গাত্র-কন্ডুয়ণ। ভিতরের অবস্থা একটু একটু করে বাইরে প্রকাশ পেতে শুরু করল। এরই নাম সোরা। এই দৈহিক পরিবর্তনই সোরার বাহ্য বিকশিত রূপ।

যেমন সূর্য ও সূর্য রশ্মি এক নয়, যেমন তাপ ও তাপমাত্রা এক নয়, তেমনই সোরা ও সোরার ফল (খোস পাঁচড়া) এক নয়।

অনেকেই সোরাকে খোস চুলকানি বলে মনে করেন। বস্তুত তা নয়। চুলকানি সোরার ফল মাত্র বা কার্য মাত্র। সোরা না থাকলে খোস চুলকানি হত না। তাই কন্ডুয়ণ থাকলে সোরা দোষ নিশ্চয় আছে তা মানতেই হয়।

সোরা দোষের মত আরও কিছু দোষ সোরা পরবর্তী পর্যায়ে মন ও শরীরকে আক্রান্ত করে। তারা হল প্রমেহ, ক্ষয়, উপদংশ। অর্থাৎ সাইকোসিস, টিউবারকুলার এবং সিফিলিস। হ্যানিম্যান মূলত ত্রিধারা মায়াজমের কথা বললেও পরবর্তী ক্ষেত্রে সংকর মায়াজম বা মিশ্রিত মায়াজমের কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন আদি সংখ্যা ১,২,৩,৪ হলেও দশমিক পদ্ধতি আসার পর ১.২,১.৩,২.৫ - কে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। তাই হ্যানিম্যান বর্ণিত সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিসের পাশাপাশি যুক্তি সাপেক্ষে টিউবারকুলার, ক্যান্সারাস প্রভৃতি মায়াজমের প্রসঙ্গও আলোচনা করব।

যাই হোক, এই মুহূর্তে একথা বলা যেতে পারে যে, সোরা দোষ উপস্থিত না থাকলে মেহ বা উপদংশ শরীরে আশ্রয় পেত না। সোরাশূন্য মানুষ নেই। তাছাড়া

একটা কথা, সোরার পরবর্তী পর্যায়গুলি অর্থাৎ সাইকোসিস, টিউবারকুলার বা সিফিলিস দোষগুলি দুষ্কর্ম বা পাপ কাজ থেকেই আসে। এগুলি হল পাপ কাজের ফল। যেহেতু প্রথমেই সোরা (Psora = ill thinking) এবং পরে সাইকোসিস (Sycosis = ill doing) এবং তার পর টিউবারকুলার (Tubercular = Oscillating) আর শেষ পর্যন্ত সিফিলিস (Syphilis = destructive result) আমরা এক্ষেত্রে বলতেই পারি ill thinking, ill doing, and its result— **অর্থাৎ কু-চিন্তা, কু-কর্ম, এবং তার ভয়ংকর পরিণতি। এই হল রোগ-তত্ত্বের অর্থাৎ মায়াজম তত্ত্বের গূঢ় ও সার কথা।**

আমি মনে করি অভিব্যক্ত মনের দুটি অবস্থা, একটি সু-চিন্তা এবং অপরটি কু-চিন্তা। সু-চিন্তক, সুমতি সম্পন্ন মানুষরা অল্পবিস্তর রোগে ভোগেন। কারণ তাদের মনের স্বাচ্ছন্দ্য। কু-মতিচ্ছন্ন লোকেরা ভোগেন অনেক বেশি। তার কারণ সর্বজন বিদিত। প্রথমে আমরা সর্বজন বিদিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যখন সোরার অস্তিত্ব বর্তমান, তখন তার 'সু'এবং 'কু' এই দুটি দিককেই কম বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কু-চিন্তাই যদি মনোকন্ডুয়ণের প্রধান কারণ হয়, তবে সোরার 'সু'-বলেও নিশ্চয় কিছু কথা আছে। সোরার 'সু'-দিক গুলি সর্বদা সৃজনশীলতার পথেই হেঁটেছে। যেমন - সৃষ্টিশীল মানসিকতা, কবিতা সাহিত্য রচনা, ছবি আঁকা, গান বাজনা করা, ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল ভাবে পড়াশুনায় আগ্রহ, ভাল কিছু একটা করার বাসনা, নৃত্যকলা প্রভৃতি। মনের অসুস্থতাই যদি রোগের কারণ হয় তবে—সুস্থ মনের ক্ষমতা, দৃঢ়তা, তেজ, বীর্য, শৌর্য যা রোগব্যাধির শত হস্ত দূরে, যার প্রভাবে মনে 'কু'-স্থান পায় না, তার সেই ক্ষমতা অস্বীকার করি কিভাবে?

অনেকে এই পরিস্থিতিকে মনের সু-বিচার, সু-ভাবনা হিসাবে আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সোরার 'সু', মনকে সুলোলিত করে, সোরারই-'কু' মনকে কন্ডুয়ণতুক্ত্য করে। মনের উপর তার সু ও কু-র ক্রিয়া বলবৎ রাখে। ভাল মন্দ দুই নিয়েই সোরার প্রারম্ভিক লুকোচুরি ; খুনসুটির খেলা।

নলের শরীরে 'ছিদ্রপথে' কলির প্রবেশের কথা বলেছি। সেই সঙ্গে আদম ইভের নিষিদ্ধ ফল খাবার ঘটনাটা মনে করুন। দেখবেন কোন না কোন ছিদ্র পথের (ছিদ্র অর্থাৎ দোষ) সন্ধান পেয়েই কলি অর্থাৎ কাল — মহাকাল — যে কোন সুস্থ পরিস্থিতিকে কালিমালিপ্ত করেছে। ছিদ্র অর্থে দোষই হল ত্রুটি। ত্রুটি থেকেই বিচ্যুতি।

এবার বিচ্যুত, বিশৃঙ্খল মনের পরবর্তী অবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সোরার গতি প্রকৃতি নির্ধারক ওযুধের দ্বারা—

অন্য কথায় বলতে গেলে সোরিক ওষুধের দ্বারা—সদৃশ বিধান মেনে চিকিৎসিত হলে রোগ আর জটিলতার পথে পা বাড়াতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভবপর হয় না। কারণ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নীতি, অপহোমিওপ্যাথি ও নিয়ম বহির্ভূত সেল্ফ মেডিকেশন। ফলে প্রতি পদে পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোগ চাপা পড়ার মত ঘটনা। রোগ চাপা পড়ে বিভিন্ন কারণে (১) রোগীর সঠিক চিকিৎসা না হওয়া (২) ভুল ওষুধ, ভুল মাত্রায় প্রয়োগ (৩) যথেচ্ছ ওষুধ সেবন (৪) বাহ্যিক মলমের ব্যবহার (৫) ইঞ্জেকশন।

ফলে রোগটির যথার্থ বহিঃপ্রকাশ হতে না পেরে ও অপচিকিৎসার ফলে রোগটি (সোরার প্রবৃত্তি) অন্তর্মুখী হয়ে জটিল আকার ধারণ করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ সহজ সরল জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে।

কখনও বাহ্যিক মলম, কখনও তীব্র শক্তিসম্পন্ন ভেষজ, কখনও ইঞ্জেকশন, অপ্রয়োজনে হাই ডোজের এ্যান্টিবায়োটিক, এমন কি অল্পমাত্রার স্টেরয়েড, গভীর ক্রিয়াশীল হোমিও ওষুধ, নোসোড জাতীয় ওষুধের অপব্যবহার — সমান ভাবেই রোগকে জটিল করার জন্য যথেষ্ট। কারণ উপরিউক্ত পরিস্থিতিগুলি রোগকে শুধুমাত্র চাপাই দেয় না, অবদমনও করে। অবদমন অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতি—পরে অবদমন নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

সোরা যখন ক্রমান্বয়ে সাইকোসিস এবং সিফিলিসের সাথে মিশ্রিত হয় তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কারণ মানবদেহ কুকার্যের ফলে প্রথমে প্রমেহ (সাইকোসিস) বা উপদংশ (সিফিলিস) দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন প্রকৃতিগত ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হলে তা আরোগ্য হতে পারে। তা না হয়ে যদি অ্যালোপ্যাথিক মতে বিশেষত ইঞ্জেকশন দ্বারা রোগশক্তিকে অন্তর্মুখী করা হয় তখন সংমিশ্রিত সোরা-সাইকোসিস-সিফিলিস মানব শরীরকে পীড়ার আধারে পরিণত করে। দুরারোগ্য বাত, ক্ষয় রোগ এবং আধুনিক সভ্যযুগের ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়া, হৃদরোগ সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য, আরোগ্য অসাধ্য রোগ এই মিলনের ফল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয় না। হোমিওপ্যাথির নিয়ম মেনে আপনি যতক্ষণ না তা সেবন করাচ্ছেন ততক্ষণ তাকে হোমিওচিকিৎসা বলা চলে না। বহুল ব্যবহৃত প্রকৃত নীতিগুলি হোমিওপ্যাথদের কারও জানতে বাকি নেই। প্রকৃত, চির বা প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার সময় (true chronic disease) সেই নীতি মানা একান্ত আবশ্যক। হোমিওনীতি এখানে বলার দরকার আছে। তা হল (১) সদৃশ লক্ষণ অনুসারে ওষুধ নির্বাচন (২) সূক্ষ্ম মাত্রায় শক্তিকৃত ওষুধ প্রয়োগ (৩) এক সময়ে একটি ওষুধের প্রয়োগ (৪) ধীরে

ধীরে ওষুধের শক্তি বৃদ্ধি নীতি অনুসরণ করা (৫) সঠিক সময়ে মায়াজম ভিত্তিক ওষুধের প্রয়োগ, প্রভৃতি।

হোমিওপ্যাথির স্রষ্টা মহাত্মা হ্যানিম্যান থেকে শুরু করে প্রভূত প্রথিতযশা হোমিও চিকিৎসকগণ তাঁদের কৃতিত্ব রেখেছেন এই হোমিও চিকিৎসাশাস্ত্রে। কোন নামকেই ছোট করা চলে না, আবার তাঁদের স্বকীয় চিকিৎসা নীতিও অস্বীকার করা চলে না। শুধু হ্যানিম্যান নন — হোমিওপ্যাথিকে আরও গ্রহণযোগ্যতার দাবিদার করেছেন তাঁর প্রকৃত অনুগামীরা। সেই হিসাবে শুধু মাত্র mono-mini-simi (Mono=Single medicine, Mini= Minimum dose, Simi= Similar medicine)- নিয়ে 'অতি ক্লাসিক্যাল' দেখাতে গেলে আমাদের রোগ আরোগ্য অনেকাংশেই বিঘ্নিত হবে, বিলম্ব হবে। হ্যানিম্যান পরবর্তী হোমিওগবেষকরা যেমন - কেন্ট, বনিংহোসেন, ন্যাস, বোরিক, এ্যালেন, ফ্যারিংটন, হেরিং, বার্নেট প্রমুখের রোগারোগ্য নীতি থেকে বিভিন্ন আদর্শ ও নীতিগত চিকিৎসা পদ্ধতি উঠে এসেছে। রোগীর রোগের পরিস্থিতির প্রকৃত বিচার করে তবেই আমাদের এগোতে হবে। হোমিওপ্যাথি আজ ২০০ বৎসর অতিক্রান্ত। হোমিওপ্যাথির শাশ্বত নীতি যদিও প্রাকৃতিক—তাই সেই নীতির পরিবর্তন না ঘটলেও ২০০ বৎসর অতিক্রান্ত রোগ জটিলতার কথা অস্বীকার করা যায় না, ফলে গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরকার পড়ছে উচ্চ শক্তিকৃত ওষুধের। দরকার হচ্ছে নোসোড জাতীয় ওষুধের পুনঃপুন প্রয়োগের। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে প্রকৃত আরোগ্য বলতে যা বোঝায় তা আর সম্ভবপর হচ্ছে না। চিকিৎসকরা তা পারছেন না। তার অন্যতম কারণ রোগের জটিলতা, চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি, রোগীর মানসিকতা ও ধৈর্যের অভাব ইত্যাদি। ফলে আরোগ্যের চেয়ে উপশমের পথটাই রোগী ও চিকিৎসকের কাছে বর্তমানে শ্রেয় বলেই মনে হচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর পূর্ববর্তী রোগকষ্ট পুনরায় শরীরে দেখা দিলে রোগীরা আবার চিকিৎসকের কাছে যান। তখন পুনরায় কেসটেকিং করে এ্যান্টি মায়াজমেটিক ওষুধ প্রয়োগ করে চিকিৎসা কার্য শুরু করতে হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কোন না কোন মায়াজম আরোগ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই মায়াজমেটিক ব্লক দূর করতে হবে ও পরে সদৃশবিধান মেনে ওষুধ দিলে তবেই আরোগ্য লাভ সম্ভব হবে।

লক্ষণ সমষ্টির সামগ্রিক অবস্থার স্থায়ী বিলুপ্তই হল আরোগ্য। লক্ষণ সমষ্টি মানে রোগীরা যেসকল কষ্ট নিয়ে আসে তা নয়। সেই সঙ্গে যে সকল প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া যায় তার পর্যালোচনাও করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় পিত্তপাথুরির রোগীকে নির্বাচিত ওষুধ দিলে তার লক্ষণ চলে যায় ও রোগী বেশ ভাল থাকে। কিন্তু তার পিত্ত থলির পাথর হয়তো ছোট হল, কিছু সম্পূর্ণ চলে গেল না। অতএব প্রকৃত আরোগ্য সম্বন্ধে চিকিৎসককে সচেতন হতে হবে।